তাওহীদ পন্থীদের নয়নমণি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৬৬তম অধ্যায় - তারা আল্লাহ তাআলার যথাযথ বড়ত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি (باب ما جاء في وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.............الخ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ আব্দুর রাহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ)

তারা আল্লাহ তাআলার যথাযথ বড়ত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি - ২

ইবনে জারীর তাবারী (রঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ইউনুস। ইউনুস বলেনঃ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ইবনে ওয়াহাব। ওয়াহাব বলেনঃ ইবনে যায়েদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে যায়েদ বলেনঃ ‘‘আমার পিতা আমাকে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«ما السموات السبع فى الكرسى إلا كدراهم سبعة القيت فى ترس»

‘‘কুরসীর মধ্যে সাত আসমানের অবস্থান ঠিক তেমনি যেমন একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের অবস্থান’’। তিনি আরো বলেনঃ ‘আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ ‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি,

«ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد القيت بين ظهرى فلاة من الأرض»

‘‘আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান ঠিক সে রকমই যেমন ভূপৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত ময়দানে পড়ে থাকা একটি আংটি’’।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

«ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمس مئة عام ومابين كل سماء مسيرة خمس مائة عام وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة خمس مئة عام وما بين الكرسي والماء مسيرة خمس مئة عام والعرش على الماء والله عز و جل على العرش يعلم ما أنتم عليه»

‘‘দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এমনিভাবে সপ্তমাকাশ এবং কুরসীর মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। কুরসী এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ তাআলা আরশের উপরে। তোমাদের আমলের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়’’।

হাম্মাদ বিন সালামা হতে এই হাদীছ ইবনে মাহদী, ইবনে মাহদী বর্ণনা করেন আসেম হতে, আসেম বর্ণনা করেন যির্ হতে, তিনি বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে। অনুরূপ বর্ণনা করেন মাসউদী আসেম হতে, তিনি আবি ওয়ায়েল হতে এবং তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী (রঃ) উপরোক্ত সনদ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেনঃ অনেক সনদে এই বর্ণনা এসেছে।

আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম একবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ

«هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِى آدَمَ شَىْءٌ»

"তোমরা কি জানো, আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত?" আমরা বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে অধিক জানেন। তিনি বললেন, আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। প্রতিটি আকাশের ঘনত্বও পাঁচশ বছরের পথ। সপ্তমাকাশ ও আরশের মধ্যখানে রয়েছে একটি সাগর। যার উপরিভাগ ও তলদেশের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহ তাআলা এর উপরে রয়েছেন। আদম সন্তানের কোন কর্মকান্ডই তাঁর অজানা নয়"। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[10]

ব্যাখ্যাঃ আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের হাদীছটি লেখক এখানে সংক্ষিপ্ত করে উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদের বর্ণনাটি ঠিক এ রকম, আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ

«كُنْتُ فِى الْبَطْحَاءِ فِى عِصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ قَالُوا السَّحَابَ قَالَ وَالْمُزْنَ قَالُوا وَالْمُزْنَ قَالَ وَالْعَنَانَ قَالُوا وَالْعَنَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ أُتْقِنِ الْعَنَانَ جَيِّدًا قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَالُوا لاَ نَدْرِى قَالَ إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أَوِ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلاَفِهِمْ وَرُكَبِهِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ»

"আমি একদা একদল সাহাবীর সাথে খোলা ময়দানে বসা ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেখানে ছিলেন। তখন তাদের উপর দিয়ে এক খন্ড মেঘ অতিক্রম করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে তাকিয়ে বললেনঃ তোমরা এটিকে কী বলো? তারা বললেনঃ السحاب "এটি একটি মেঘের খন্ড"। তিনি তখন বললেনঃ والمزن (আল-মুযন)। সাহাবী বললেনঃ আমরা এটিকে মুযনও বলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ والعنان (আল-আনান)। সাহাবীগণ বললেনঃ আমরা আনানও বলি। সবগুলো শব্দের অর্থ মেঘ। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বলেনঃ আমি আনান শব্দটি ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি জান আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের দূরত্ব কতটুকু? সাহাবী বললেনঃ আমরা জানিনা। তিনি বললেনঃ উভয়ের মধ্যে রয়েছে হয় একাত্তর বছরের, না হয় বাহাত্তর বছরের না হয় তেহাত্তর বছরের দূরত্ব। এমনি প্রত্যেক আকাশ ও তার পরবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে একই রকম। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতটি আসমান গণনা করলেন। সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে একটি সাগর। সাগরের উপর হতে নীচের দূরত্ব (গভীরতা) হচ্ছে এক আসমান থেকে অন্য আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। সাগরের উপরে রয়েছে আটটি ওয়া-ইল (বিশেষ আকৃতির আট ফেরেশতা। তাদের হাঁটু থেকে পায়ের খুর পর্যন্ত দূরত্ব এক আসমান থেকে অন্য আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। তাদের পিঠে রয়েছে আল্লাহর আরশ। আরশ এত বিশাল যে, তার নীচের অংশ হতে উপরের ছাদ পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে এক আসমান থেকে অন্য

আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রয়েছেন আরশের উপরে’’।[11]

হাফেয যাহাবী (রঃ) বলেনঃ ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তাতে রয়েছে,

«بُعْد مَا بَيْن سَمَاء إِلى سَمَاء خَمْسِمِائَةِ عَامٍ»

‘‘এক আসমান হতে অন্য আসমানের মধ্যকার দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ’’।

হাফেয যাহাবী (রঃ) বলেনঃ উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ পাঁচশত বছরের দূরত্ব হবে কাফেলা তথা উটের গতি অনুপাতে এবং তেহাত্তর বছরের দূরত্ব হবে দ্রুতগামী ঘোড়ার চলার গতি অনুপাতে।

ব্যাখ্যাকার বলেনঃ বুখারী ও মুসলিম এবং হাদীছের অন্যান্য কিতাবে এই হাদীছের শাওয়াহেদ (সমর্থনে অন্যান্য হাদীছ) রয়েছে। কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যও হাদীছের মর্মার্থকে সমর্থন করে। সুতরাং যারা এই হাদীছকে দুর্বল বলেছেন তাদের কথার কোন মূল্য নেই।[12]

সম্মানিত লেখক (রঃ) এই মহান কিতাবের শুরুতেই তাওহীদুল উলুহীয়াতের আলোচনা করেছেন। কেননা এই উম্মতের পরবর্তী যামানার অধিকাংশ লোক এই প্রকার তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাওহীদের পরিপন্থী বিষয় তথা শির্কে লিপ্ত হয়েছে। শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রঃ) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই প্রকার তাওহীদের বিবরণ দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণও এই তাওহীদের দিকে মানুষকে আহবান করেছেন এবং তারা এই তাওহীদের বিপরীত যেই শির্কী কাজ-কর্মে লিপ্ত ছিল তা থেকে নিষেধ করেছেন।

তাওহীদের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া দ্বীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। যারা এই তাওহীদকে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়ার তাওফীক ও ক্ষমতা দিন এবং যারা এর বিরোধীতা করে এবং তাঁর এবাদতে অন্যকে শরীক করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার শক্তি দিন! আমীন।

হে পাঠক! আপনি দেখছেন যে, লেখক এই কিতাবের অধ্যায়সমূহে তাওহীদে উলুহীয়ার মাসআলাসমূহ বর্ণনা করেছেন এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাতের আলোচনার মাধ্যমে কিতাব সমাপ্ত করেছেন। কেননা অধিকাংশ লোক এই প্রকার ইলমের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেনা। শুধু আলেমরাই এই প্রকার ইলমের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

যে সমস্ত লোক ইলম চর্চায় ব্যস্ত হয়েছে, তারাও আবার এই প্রকার জ্ঞান অর্জন করেছে তর্কশাস্ত্রবিদদের থেকে এবং তাদের প্রতিই তারা ভালো ধারণা পোষণ করেছে। তারা মনে করেছে যে, আহলে কালামরাই সঠিক পথে রয়েছে। এটি মনে করেই এক শ্রেণীর আলেম তাদের মাযহাবকে কবুল করে নিয়েছে এবং তাদের কাছে যা কিছু পেয়েছে তাই তারা গ্রহণ করেছে। তারা জাহমীয়াদের মাযহাবকেই সহীহ বলেছে এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ব্যাপারে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। এই কারণে তারা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল, সালফে সালেহীনদের মত এবং তাফসীর ও হাদীছের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ইমামদের বিরোধীতা করেছে।

তবে সুখবর হচ্ছে, এরপরও আহলে সুন্নাতের লোকেরা হকের ইপর কায়েম রয়েছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। আল্লাহ তাআলা এই সম্মানিত ইমামকে এই প্রকার তাওহীদকে ভালোভাবে বুঝার তাওফীক দিয়েছেন। তাই তিনি কুরআন ও সুন্নাহর দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে তাওহীদুল উলুহীয়াকে সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করেছেন। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি সত্যের পথ দেখিয়েছেন এবং তা কবুল করার তাওফীক দিয়েছেন। বিশেষ করে যখন সঠিক ইসলাম প্রায় অপরিচিত হয়ে গিয়েছিল এবং বহু গ্রাম ও শহরের অনেক লোক সঠিক দ্বীন থেকে

বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহই একমাত্র তাওফীক দাতা।

এই সংক্ষিপ্ত কিতাবে লেখক তিন প্রকার তাওহীদকেই একত্রিত করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) কাসীদায়ে নুনীয়ার মধ্যে এই তিন প্রকার তাওহীদের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

والعلوم أقسام ثلاث ما لها + من رابع والحق ذو تبيان

علم بأوصاف الإله وفعله + وكذلك الأسماء للرحمن

والأمر والنهي الذي هو دينه + وجزاؤه يوم المعاد الثاني

ইলম মোট তিন প্রকার, এর চতুর্থ প্রকার নেই। সত্য খুবই সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল। আল্লাহর গুণাবলী এবং তাঁর কার্যাবলীর জ্ঞান। এমনি রয়েছে রাহমানের অনেক নাম। আরেক প্রকার হচ্ছে আদেশ ও নিষেধের জ্ঞান। এরই নাম হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। এর উপর আমল করার বদলা আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন। এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) والارض جميعا قبضته يوم القيامة এর তাফসীর জানা গেল। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে আল্লাহ তাআলার হাতের মুঠোয়।

২) এ অধ্যায়ে আলোচিত জ্ঞান ও এ সম্পর্কিত জ্ঞানের চর্চা তথা আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত জ্ঞান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর যুগের ইহুদীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো। তারা এ জ্ঞানের না তাবীল করেছে এবং না অস্বীকার করেছে।

৩) ইহুদী পন্ডিত যখন কিয়ামতের দিনে আল্লাহর ক্ষমতা সংক্রান্ত কথা বলল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথাকে সত্যায়ন করলেন এবং এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতও নাযিল হলো।

৪) ইহুদী পন্ডিত কর্তৃক আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কিত মহাজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর হাসির উদ্রেক হওয়ার রহস্য জানা গেল।

৫) আল্লাহ তাআলার দু’হস্ত মোবারকের সুস্পষ্ট উল্লেখ। আকাশ মন্ডলী তাঁর ডান হাতে, আর সমগ্র যমীন তাঁর অপর হাতে থাকবে।

৬) অপর হাতকে বাম হাত বলে নামকরণ করার সুস্পষ্ট ঘোষণা।[13]

৭) কিয়ামতের দিন অত্যাচারী এবং অহংকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির উল্লেখ।

৮) “তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষা দানার মত” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর এ কথার তাৎপর্য। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর হাতের তালুতে সাত আসমান ও সাত যমীন সেভাবেই থাকবে, যেভাবে থাকে কোনো মানুষের হাতে সরিষার একটি দানা।

৯) আকাশের তুলনায় আল্লাহর কুরসী অনেক বিশাল।

১০) কুরসীর তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

১১) আল্লাহর আরশ কুরসী এবং পানি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

১২) প্রতিটি আকাশের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানের উল্লেখ।

১৩) সপ্তমাকাশ ও কুরসীর মধ্যে ব্যবধান।

১৪) কুরসী এবং পানির মধ্যে দূরত্ব।

১৫) আরশের অবস্থান পানির উপর।

১৬) আল্লাহ তাআলা আরশের উপরে।

১৭) আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের উল্লেখ।

১৮) প্রতিটি আকাশের ঘনত্ব পাঁচশ বছরের পথ।

১৯) আকাশ মন্ডলীর উপরে যে সমুদ্র রয়েছে তার উর্ধ্বদেশ ও তলদেশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

ফুটনোট

[10] - ইমাম আলবানী (রঃ) এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন, দেখুনঃ শরহুল আকীদুত্ তাহাবীয়া, (১/৩০৫)।

[11] - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাফসীর, মুসনাদে আহমাদ, (১/২০৬)। আলেমগণ হাদীছটি সহীহ ও যঈফ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম হাদীছটি সহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান গরীব। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুনঃ সিলসিলা যঈফা, হাদীছ নং- ১২৪৭। যঈফ হওয়া সত্ত্বেও আলেমগণ আসমানের উপর আল্লাহর সমুন্নত হওয়া প্রমাণ করতে গিয়ে হাদীছটিকে উল্লেখ করেছেন। তবে আল্লাহ্ তাআলা উপরে হওয়ার বিষয়ে অনেক বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণ থাকার পরও এ ধরণের যঈফ হাদীছ দ্বারা দলীল না গ্রহণ করাই উত্তম।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা এই যে, أوعال (আওআল) শব্দটি وعل এর বহুবচন। এর অর্থে আলেমগণ থেকে একাধিক উক্তি পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেছেনঃ এরা হচ্ছেন বিশাল আকারের ফেরেশতা। কুরআনে ফেরেশতা কর্তৃক আরশ বহনের কথা সুস্পষ্ট করেই বলা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেনঃ আওআল হচ্ছে আলাহর বিশেষ এমন এক সৃষ্টি, যার প্রকৃত রূপ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ জানেনা। কেউ কেউ বলেছেনঃ আওআল হচ্ছে বিশাল আকারের ষাঁড়। আবার কেউ বলেছেনঃ বিরাট আকৃতির শকুন। মোট কথা এগুলো পৃথিবীর পরিচিত কোনো প্রাণী নয়; ফেরেশতা। (আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[12] - মূলত বুখারী ও মুসলিমে এই দীর্ঘ হাদীছের কোন সমর্থক পাওয়া যাচ্ছেনা। তবে আল্লাহ তাআলা যে আসমানের উপর- এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে রয়েছে অসংখ্যা দলীল-প্রমাণ। তা থেকে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলোঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন”। (সূরা তোহাঃ ৫) এ অর্থে কুরআন মজীদে সাতটি আয়াত রয়েছে। (১) আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“দয়াময় আল্লাহ্ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন”। (সূরা তোহাঃ ৫)

(২) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

“নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি আসমান-যমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। (সূরা আ’রাফঃ ৫৪) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

“নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি আসমান-যমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন”। (সূরা ইউনূসঃ ৩)

(৩) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

“আল্লাহই ঊর্ধবদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা স্তম্ভে। তোমরা এটা দেখছো। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন”। (সূরা রা’দঃ ২)

(৫) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ

‘‘অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন’’। তিনি পরম দয়াময়। (সূরা ফুরকানঃ ৫৯)

(৬) আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

‘‘আল্লাহই আকাশ-যমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্ত্ত ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন’’। (সূরা সাজদাহঃ ৫৪)

৭) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

‘‘আল্লাহই আকাশ-যমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। (সূরা হাদীদঃ ৪) আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ

‘‘তোমরা কি নিরাপত্তা পেয়ে গেছো যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না?। (সূরা মুলকঃ ১৬) আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ‘‘তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে আছেন’’। (সূরা নাহ্লঃ ৫০) আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

‘‘তাঁরই দিকে পবিত্র বাক্যসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে’’। (সূরা ফাতিরঃ ১০) আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃتَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ‘‘ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরীল) তাঁর দিকে উর্ধ্বগামী হয়’’। (সূরা মাআরেজঃ ৪) আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ

‘‘আল্লাহ্ তাআলা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন’’। (সূরা সিজদাহঃ ৫) আল্লাহ্ তা’আলা বলেনঃ

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

‘‘যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু দান করব। অতঃপর তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিবো’’। (সূরা আল-ইমরানঃ ৫৫) আল্লাহ্ তাআলা উপরে আছেন- এ মর্মে আরো অনেক দলীল রয়েছে। হাদীছেও রয়েছে অনেক দলীল। যেমনঃ

(১) সা’দ বিন মুআয যখন বনী কুরায়যার ব্যাপারে ফয়সালা দান করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তুমি তাদের ব্যাপারে সেই ফয়সালা করেছ, যা সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ্ তাআলা করেছেন’’।[12]

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা জনৈক দাসীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আল্লাহ্ কোথায়? দাসী বললঃ আকাশে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাসীর মালিককে বললেনঃ তুমি তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে মুমিন’’।

(৩) আল্লাহ্ তাআলা আকাশের উপরে। মি’রাজের ঘটনায় বর্ণিত হাদীছগুলো তার সুস্পষ্ট দলীল।

(৪) পালাক্রমে ফেরেশতাদের দুনিয়াতে আগমণের হাদীছেও আল্লাহ্ তাআলা আকাশের উপরে বিরাজমান হওয়ার দলীল রয়েছে। হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»

‘‘তোমাদের নিকট রাতে একদল ফেরেশতা এবং দিনে একদল ফেরেশতা পালাক্রমে আগমণ করে। তারা ফজর ও আসরের নামাযের সময় একসাথে একত্রিত হয়। অতঃপর তোমাদের কাছে যে দলটি ছিল, তারা উপরে উঠে যায়। মহান আল্লাহ জানা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেনঃ আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তাঁরা বলেনঃ আমরা তাদেরকে নামায অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখন তারা নামাযেই ছিল।[12] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

«مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ»

‘‘যে ব্যক্তি বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ হতে একটি খেজুর পরিমাণ সম্পদ দান করে, আর আল্লাহর নিকট তো পবিত্র ব্যতীত কোন কিছুই উর্ধ্বমুখী হয় না, আল্লাহ্ ঐ দান স্বীয় ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা দানকারীর জন্য প্রতিপালন করতে থাকেন। যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ দান পাহাড় সমুতল্য হয়ে যায়’’।[12] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ»

“আল্লাহ তা’আলা যখন আকাশে কোন বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর উক্ত ফয়সালার প্রতি অনুগত হয়ে তাদের পাখাসমূহ এমনভাবে নাড়াতে থাকেন যার ফলে শক্ত পাথরে শিকল দিয়ে প্রহার করলে যে ধরণের আওয়াজ হয় সে রকম আওয়াজ হতে থাকে”।[12] আল্লাহ তাআলা আকাশের উপরে- জাহমীয়া ফির্কা ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করেনি।

[13] - পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আল্লাহর অপর হাতকে বাম হাত বলে নামকরণ করা ঠিক নয়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12122

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন